কবি ও অধ্যাপক

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

‘কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্তা, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।’ বঙ্কিমচন্দের এই কথাটি সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে এসে আক্ষরিকভাবে প্রমাণ করে গেলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ‘ভিজিটিং প্রফেসর কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।’ আমাদের বিদ্যাভবনের ক্লাস সকালে হয়। শীতে ৭টা থেকে ১টা; আর গ্রীষ্মে সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে বারোটা। এবারে মার্চের শেষ সপ্তাহে গ্রীষ্মের রুটিন শুরু হয়েছে। ১৬ তারিখ সাড়ে নটা নাগাদ রতনকুঠিতে চলে এলাম নতুন ভিজিটিং প্রফেসর কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে করে বিভাগে নিয়ে আসার জন্য। রতনকুঠির সামনে রয়েছে লাল মেঝের বিরাট এক বারান্দা-বাড়ির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত জুড়ে। লাল কাঁকর বিছানো পথের দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি গোল সবুজ দুটি বেতের চেয়ারে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন শক্তি ও মীনাক্ষী। বিভাগে কখন এসে পৌঁছোবেন, এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে একটা আবেগ অনুভব করছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে পোশাক পালটে নেন। তারপর রতনকুঠি থেকে মন্দিরের পাশ দিয়ে বিভাগে এসে পৌঁছোই। শক্তির পরনে সেদিন ছিল প্যান্ট, লাল বুশ শার্ট আর জহরকোট। জয়েনিং রিপোর্ট লিখলেন বিশ্বভারতী প্যাডের কাগজে বাংলা ভাষায়। লিখলেন—

মাননীয় কর্মসচিব
(বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে)
সবিনয় নিবেদন,
আমি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আজ থেকে এখানে ‘ভিজিটিং প্রফেসার’ হিসাবে বিভাগে যোগ দিলাম।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
১৬/০২/৯৫

পূর্বাঙ্গনা
৫ রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন
কলকাতা— ১০

পূর্ববর্তী কর্মসচিব অবসর নেওয়ায় সেই পদের দায়িত্বভার নিয়েছেন প্রফেসার প্রণবানন্দ যশ। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ অজিত নিয়োগীর মাধ্যমে সেই চিঠি আমি কর্মসচিবের নিকট পাঠিয়ে দিই অবিলম্বে। প্রফেসার চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে। সব্যসাচীবাবু চলে যাওয়ায় উপাচার্যের দায়িত্বভার নিয়েছেন অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী, কৃষিবিজ্ঞানী প্রফেসার শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়। প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে উপাচার্য আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন জানিয়েছেন। সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমরা তিনজনে তাঁর ঘরে গিয়ে আলাপ আলোচনা করি। উপাচার্য চা আনান। উপাচার্যের বয়স যাই হোক, উপাচার্য-উপাচার্য। তাই প্রবীণতম অধ্যাপকও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্যার বলেন। কিন্তু শক্তির ওসব নিয়ে কোনও মাথ্যব্যথা নেই। পুরাতন বন্ধু শিশির-শিশিরই। উপাচার্য হলেও সে শিশিরই। তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই অকপটে বলতে পারেন—শিশির, তুমি আর আমাকে নিয়ে নাড়ানাড়ি করো না, ওই রতনকুঠিতেই আমার থাকার ব্যবস্থা করে দাও। উপাযার্চও সবটুকু সম্মতি জানিয়ে বলেন— নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। উপাচার্যের কাছে শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাত্র নন, তিনি তাঁর একান্ত প্রিয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। উপচার্যের ঘরে সিগারেট ধরিয়ে মেঝেতে কাঠিটা ফেলে দেন শক্তি। মীনাক্ষী চোখের ইশারায় ছাইদানিটাকে দেখিয়ে দেয়, শক্তি হাত বাড়িয়ে সেটি কাছে টেনে নেন।

চা আসার আগেই আমাকে ও-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়। ঘড়িতে তখন বারোটা বাজে। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আসবেন বাংলা বিভাগের সেমিনারে ভাষণ দিতে। শক্তি তো খুবই খুশি শ্যামল আসছে শুনে, আরো খুশি শ্যামলের থাকার ব্যবস্থা রতনকুঠিতেই হয়েছে শুনে।

১৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যায় চীনভবনে শ্যামলের পূর্বনির্ধারিত বক্তৃতা বাংলা বিভাগের উদ্যোগে। সভায় শান্তিনিকেতনবাসীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম বক্তা শ্যামলের সঙ্গে বিশ্বভারতীর নূতন অধ্যাপক শক্তি চট্টোপাধ্যায়কেও। শক্তিকে আগেই প্রস্তাব দিয়েছিলাম, শ্যামলের সভায় বিভাগীয় অধ্যাপকরূপে আপনিই সভাটা পরিচালনা করুন। একটু ভেবে তারপরেই রাজি হয়ে যান। বলেন— বেশ রাজি, শ্যামলের সভায় আমিই সভাপতিত্ব করব। বস্তুতপক্ষে সেটাই ছিল বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকরূপে তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান। চীনভবন ভরে গেছে অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী ও আগ্রহী আশ্রমবাসীতে। মনে পড়ছিল এই চীনভবনে বসে শুনেছিলাম সুনীতি চাটুজ্জের বক্তৃতা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ। বিখ্যাত দেওয়াল চিত্রের সামনে বসে শক্তি ও শ্যামল। সভাপতি ও বক্তা। দুজনের মুখের

সামনে দুটি মাইক। সভাপতি দু-একটি আনুষ্ঠানিক কথা বলেই বক্তা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে বললেন —শ্যামল, এবার তুই তোর কথা শুরু কর। একেবারে গোড়া থেকে ধর। কবে থেকে লিখতে শুরু করলি, কেন করলি, প্রথম জীবনের কথা দিয়েই শুরু কর। শক্তির এই সামান্য কয়েকটি কথাতেই শ্রোতারা নড়েচড়ে বসল। শান্তিনিকেতনে নিত্যই তো কত সভা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু কেউ কোনদিন সভাপতির আসনে বসে সভাপতিকে এভাবে কথা বলতে শোনেনি ঃ শ্যাম, নে এবার তোর কথা শুরু কর। শ্যামল কথা শুরু করেই দু-চারবার অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলতেই শক্তির মাইক শ্যামলের কথার মাঝে গর্জে উঠল। দেখ শ্যামল, তুই যদি ওইরকম করে বলতে থাকিস, তো আমিও তোকে এখানে আপনি আজ্ঞে শুরু করে দেব। ব্যাস, তারপর থেকেই সভা প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। শক্তির মাইক ক্রমাগত শ্যামলকে উসকে দিয়ে চলেছে। গল্প আলাপে অনেক বিদগ্ধ কথায় কখন যে দুটো ঘন্টা পেরিয়ে গেল কেউ টের পেল না। বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সেই সভাতেই তাদের নতুন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ আলাপ। প্রথম আলাপেই তারা সকলে ভালোবেসে ফেলল তাদের নতুন অধ্যাপককে।

রতনকুঠিতে তিনজনে গল্প করার সময়ে শক্তিকে শ্যামলের হঠাৎ জিজ্ঞাসা - হ্যাঁরে শক্তি, তুই যে ক্লাসে পড়াবি, তোর ভয় করছে না? এক গাল হেসে শক্তির উত্তর - কেন ভয় করবে? তারপরেই আমার প্রতি জিজ্ঞাসা - কবে ক্লাস দেবে অমিত্র?

ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে ওঁর অদম্য আগ্রহ। আসা অবধি একটাই শুধু দাবি - কবে ক্লাস দেবে বলো। থাকা খাওয়া বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো অভিযোগ অনুযোগ নেই। জিজ্ঞাসা, কোন্ ক্লাস কবে পাবেন। এদিকে ১৮ তারিখেও ক্লাস দিতে পারছি না, ১৯ তারিখেও নয়। স্পোর্টস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগে দুদিন ক্লাস বন্ধ। সুতরাং প্রথম ক্লাসের দিন নির্দিষ্ট হল ২১ ফেব্রুয়ারি, বাংলা বিভাগের সেমিনার ঘরে দুপুর ১২টায়। কী বিষয়ে ক্লাস নেবেন? বললেন শান্তিনিকেতন থেকে তেমন কবিতা জন্মাচ্ছে না কেন? এখানকার ছেলেমেয়েরা কি কবিতা লেখে না? তাহলে এখান থেকে কোন কবি তেমনভাবে উঠে আসছে না কেন? অমিত্র, আমি ওদের পদ্য লেখা শেখার ক্লাস নেব। জানতো, আমি আমার কবিতাকে কবিতা না বলে পদ্য বলি। তারপর হেসে বলেন— ওটার আর কোনো কারণ নেই, শুধু বিনয়।

২০ তারিখ বিভাগে গিয়েই নোটিশ দিই— আজ ২০ তারিখ সোমবার বাংলা বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'কবিতা লেখা শেখার ক্লাস' নেবেন সেমিনার ঘরে বারো টার সময়। শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, কবিতার প্রতি যাঁদের অনুরাগ, তাঁদের সকলের জন্য এই ক্লাস।

তিন-চারটি ছেলে নিজেরাই আগ্রহ করে সাড়ে এগারোটা নাগাদ অধ্যাপককে নিয়ে এল রতনকুঠি থেকে। বিভাগীয় প্রধানের ঘরে শক্তি এসে বসলেন, এক গেলাস জল খেলেন, একটি সিগারেট ধরালেন। এদিকে বাংলা ও অন্যান্য বিভাগের উৎসাহী ছেলেমেয়েতে সেমিনার ঘর ইতিমধ্যে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ঠিক বারোটার সময় আমি কবিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়ে উঠে নতুন অধ্যাপককে সম্মান জানাল।

কী আশ্চর্য সুন্দরভাবে আরম্ভ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রথম ক্লাসটি। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, আবার সেই কবিই যদি নিজে স্বয়ং শিক্ষকের আসনে বসে কথা বলেন তাহলে প্রত্যক্ষ ছাত্রদের পক্ষে সে তো এক আশ্চর্য শিহরনজাগা অভিজ্ঞতা।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম উক্তি— দেখো, আমাকে তোমরা তোমাদের একজন বন্ধু বলে মনে করো। আমি তোমাদের বন্ধু, তোমরা আমার বন্ধু। বন্ধুত্বের সম্পর্কে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলব, আলাপ আলোচনা করব। তোমরাও সেই বন্ধুত্বের সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। কথাগুলো ধীরে ধীরে বললেন, কিন্তু উচ্চ তাঁর কণ্ঠস্বর অথচ কী গভীর মধুর দরদি তাঁর বাচনভঙ্গি। এত স্নেহ মাখানো বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কোনো মাস্টারমশাইকে কথা বলতে আমি শুনিনি। প্রতিটি শব্দোচ্চারণ ভালোবাসার আবেগ দিয়ে মোড়া। সন্তানের সঙ্গে পিতারা যেভাবে কথা বলেন সেই সুরে সেই সম্পর্কে ছাত্রদের কাছে টেনে নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

– দেখো আমি গ্রামের ছেলে। গ্রাম থেকে শহরে আসি। আমার কবিতায় তাই পল্লিবাংলার অনেক শব্দের ব্যবহার আছে। জীবনানন্দের কবিতার দ্বারা আমি প্রথমে খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছিলাম। পরে আমি তা কাটিয়ে উঠি। আমি প্রথমে আমার ছোটোবেলার কথা দিয়ে শুরু করব। বলে শুরু করলেন স্যার আশুতোষের চেহারার মতো মানুষ তাঁর দাদামশায়ের গল্প দিয়ে।

আগের দিন শক্তি ও মীনাক্ষীর সঙ্গে বসে কথা হচ্ছিল। বলছিলাম, সময় সুযোগমতো আপনার একটা দীর্ঘ ইনটারভিউ আমি নিয়ে রাখতে চাই। আপনাদের সাক্ষাৎকারগুলি সংকলন করে একালে আর-একটি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বই তৈরি করা যেতে পারে। বছর তিনেক আগে এই শান্তিনিকেতনে বসে একটি পুজোর ছুটিতে সাগরদার একটা সুদীর্ঘ ইনটারভিউ নিয়ে পরে সেটা খাতায় টুকে নিয়ে ওঁকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিই। সাগরদার আদেশ, মৃত্যুর আগে

এ-লেখা কোথাও ছাপা চলবে না। শক্তিকে বলি, আপনি শান্তিনিকেতনে বসে একটি আত্মজীবনী লিখতে শুরু করুন। আপনার কথা, আপনার দেশ কালের কথা, সমকালীন সাহিত্যের কথা, সাংবাদিকতার কথা। শক্তি বলেন —সাগরদাও আমাকে এরকম একটা লেখা বড়ো করে তৈরি করতে বলেছেন।

মীনাক্ষী এই সময় স্বামীকে এই লেখার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন।

দাদামশায়ের গল্প দিয়ে যখন ক্লাস শুরু হল তখন মনে মনে ভীষণ খুশি হলাম। নিশ্চিন্ত হলাম, আত্মজীবনীটি লেখার খসড়া এই ক্লাস বক্তৃতা থেকেই শুরু হল।

মিনিট দশেক রসিয়ে রসিয়ে গ্রামের গল্প বলেই শহরে চলে এসেন শক্তি। তারপরেই হঠাৎ যেন কথা বলার মতো খেই হারিয়ে ফেলেন। বাইরের দরোজাটা দিয়ে দূরের শিমুল গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এটা যে ক্লাস, উনি যে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন, সামনে যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ওঁর কথা শোনার জন্য বসে আছে —সব যেন ভুলে গেছেন। তিরিশ সেকেন্ড, এক মিনিট, দু মিনিট, ছেলে মেয়েরা নিস্তব্ধ, কিন্তু চোখ দিয়ে পরস্পরে এ-ওর সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছে। ক্লাসের মধ্যেই একটা অস্বস্তিকর নীরব শূন্য অবস্থা। অধ্যাপক কথা বন্ধ করে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে ওঁর যেন আর কিছু বলার নেই, যা কিছু বলার জন্য ভেবে এসেছিলেন, সবই যেন বলা হয়ে গেছে এই দশ মিনিটেই। হঠাৎ মিনিট দুই পর ক্লাসের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে আমাকে খুব সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—অমিত্রসূদন, এখন আমি এদের কী পড়াব? আমি উঠে বললাম— আপনি তো ছেলেমেয়েদের কেমন করে কবিতা লিখতে হয় হাতে কলমে শিখিয়ে দেবেন বলেছিলেন। ওরা তো আপনার কাছ থেকে শেখবার জন্য অপেক্ষা করছে, আপনার কথা শোনবার জন্য বসে আছে। আপনি ওদের সৃষ্টির কৌশল শিখিয়ে দিন।

হ্যাঁ তাইতো। বলেই কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ফিরে এলেন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় ক্লাসরুমের চার দেওয়ালের মধ্যে। তারপরেই শুরু হল বাংলা ছন্দের বিচিত্র কলাকৌশল নিয়ে মনমাতানো চমকপ্রদ টানটান ক্লাস। শুধু অধ্যাপক নয়, ক্লাসভর্তি সমস্ত ছাত্রছাত্রী ছন্দের দোলায় দুলছে। শক্তি কবিতা পড়া, কাঠের টেবিলে হাত চাপড়ে ছন্দের মাত্রা গোনা, বাইরে শেষ শীতের হালকা হাওয়া - সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল সমস্ত ক্লাস ঘরে তখন যে পিয়ানোর বাজনা বাজছে

—দেখো, কবিতা শিখতে গেলে আগে কানটা খুব তৈরি হওয়া চাই। কানটাকে খুব সজাগ রাখতে হবে। ছন্দের মাত্রার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হতে না পারলে কবিতা লেখা যাবে না। আমি তোমাদের ছন্দের কান তৈরি করে দেব। যে গদ্য কবিতা লিখবে তাকেও আগে ছন্দের মাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ছন্দের মাত্রা যে জানে না গদ্য কবিতা লেখার অধিকার তার হবে কেন? ছন্দের তো নানারকম ভাগ আছে, আমি আজ তোমাদের সঙ্গে ছড়ার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করব।

হাতে কোনও খাতা নেই, পয়েন্টস্ নেই, স্মৃতি থেকে একটির পর একটি কবিতাও ছড়া উদ্ধৃত করে ছাত্রছাত্রীদের একেবারে সরলভাবে বুঝিয়ে দিলেন ছড়ার ছন্দের কৌশল ও বৈশিষ্ট্য কী। সুকুমার রায়ের কবিতা থেকে উদাহরণ দিলেন, দৃষ্টান্ত দিলেন নিজের কবিতা থেকেও। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তাঁর ক্লাসগুলি ছিল অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বিশ্বভারতীতে বাংলা ছন্দচর্চার একটা খ্যাতি আছে সুদীর্ঘ কাল থেকে। প্রথম আমলে ছন্দের শিক্ষকতা করেছেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। একালে তাঁর দুটি সুযোগ্য ছাত্রছাত্রী, কন্যা ডঃ সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃতী ছাত্র ডঃ রামবহাল তেওয়ারী ছন্দের ক্লাস নেন। পরীক্ষার হলে জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ছন্দ হয়তো তাদের স্ক্যান করতে হয়। ঠিক হল, কি ঠিক হল না হয়তো তাদের মনে মধ্যে সংশয় একটু থেকেই যায়। কিন্তু সেই ছন্দবিভাজন যদি স্বয়ং কবিই এসে ক্লাসরুমে করে দিয়ে যায় তবে সেটা কেমন হয়? এমন ঘটনা তাদের কাছে স্বপ্নের মতোই মনে হয়, অথচ তাই ছিল সেদিন একান্তভাবে তাদের কাছে বাস্তব সত্য। আরও বিস্ময়ের ঘটনা হল এই যে এতকাল প্রসূন মানবেন্দ্র শুকতারা শর্মিষ্ঠা শুচিস্মিতারা পরীক্ষার খাতায় যে কবির কবিতার লাইন থেকে ভাবার্থ বা ভাবসম্প্রাসরণ করেছে বা ছন্দের মাত্রা নির্ণয় করেছে সেই কবি সশরীরে ক্লাসে এসে ছেলেমেয়েদের বললেন, তোমাদের নিজের লেখা কবিতা তোমরা আমাকে শোনাও আমাকে পড়াও, এখন থেকে তোমাদের কবিতার ছন্দের মাত্রা গণনা আমি করব।

আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আকাদেমিক ক্লাসের গণ্ডির বাইরে শক্তির ক্লাস অন্য একটি স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করল। এক মুহূর্তে শক্তি জয় করে নিলেন সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মন। মুহূর্তে ছেলেমেয়েদের ব্যাগ থেকে, পকেট থেকে বেরুতে লাগল কবিতার খাতা বা কাগজ। শক্তিদা আমি পড়ব? পড়। আমি পড়ব? পড়। আমি পড়ব? পড়। বিভাগে যে এত ছেলেমেয়ে কবিতা লেখে আমরা শিক্ষকরা তা জানতাম না। আমরা তাদের প্রশ্নোত্তর দেখে দিয়েছি লাল কালির আঁচড়ে, কিন্তু তারা তো কখনো আমাদের তাদের কবিতার খাতা দেখায়নি। অথচ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এক দিনেই তাদের মনের কত কাছে গিয়ে পৌঁছোলেন। ছাত্রদের চোখে তিনি স্নেহের পিতা,

সম্বোধনে দাদা, আর অন্তরঙ্গ মেলামেশায় প্রিয় বন্ধু। আদর্শ শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ করে অভিভূত হয়েছি।

ক্লাস শেষ হল। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে। তখনো ক্লাসের মধ্যে অধ্যাপককে ঘিরে অনেক ছাত্রছাত্রী দাঁড়িয়ে। ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক প্রফেসার সাসমল। মুখোমুখি হতেই বললেন, অসাধারণ, ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এ এক পরম সৌভাগ্য।

ছাত্রদের কাছ থেকে ছুটি পেয়ে একটু বিশ্রামের জন্য কবি আমার ঘরে এসে বসলেন। নারায়ণ চা নিয়ে এল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন - তোমাদের ছেলেরা ভালো কবিতা লেখে, ওদের ছন্দের কান চমৎকার।

জিজ্ঞাসা করলাম জীবনের প্রথম অধ্যাপনা কেমন লাগল? বললেন-খুব ভালো, ছেলেমেয়েরা বড্ড ভালো। তুমি আমাকে আবার কবে ক্লাস দেবে?

স্থির হল, তেইশ ও চব্বিশ— ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতি ও শুক্রবার পর পর দুদিন শক্তির ক্লাস হবে ওই বারোটা থেকে একটা।

প্রথম দিনের ক্লাসের পরেই শক্তির জনপ্রিয়তা হু হু করে বেড়ে যায় সারা শান্তিনিকেতনে। এ নূতন জনপ্রিয়তা কিন্তু কবির নয়, অধ্যাপক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের ক্লাসের পর শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন জুড়ে 'শক্তি' হাওয়া বইতে তাকে। কবি কাব্য কবিতা নিয়ে সমস্ত শান্তিনিকেতন জুড়ে ছাত্র অধ্যাপক কর্মীর মধ্যে এমন মাতোয়ারা ভাব গত তিন দশকের শান্তিনিকেতনে আমি কখনো দেখিনি। যারা কখনো কবিতা লেখেনি তারাও শক্তির ঐন্দ্রজালিক প্রেরণায় কবিতা লিখতে শুরু করে দিয়েছে, শিক্ষাসত্র পাঠভবনের ছাত্রছাত্রী থেকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পর্যন্ত। এরকম বেশ কিছু কবিতা আমি ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে ফেলেছি। আর তাদের প্রিয় অধ্যাপকের আকস্মিক প্রয়াণে যে ছন্দে কবিতা লিখতে শক্তি তাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, চোখের জলের সঙ্গে সেই ছন্দোবন্ধে আজও তারা শোকগাথা রচনা করে চলেছে একটির পর একটি।

বিভাগে পাঁচই মার্চ পুনর্মিলন উৎসব। এই উপলক্ষে স্মারকপত্র প্রকাশিত হবে। সম্পাদক বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আমি শ্যামাপ্রসাদকে বললাম শক্তির কাছ থেকে কবিতা আদায় কর। এবং কয়েকদিন লেগে থেকে সে একটি নূতন কবিতা সংগ্রহ করতে সমর্থ হল। এজন্য কৃতিত্ব সম্পাদকের এবং সেইসঙ্গে হঠাৎ শান্তিনিকেতনে রাতভর বৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের এই পরিবেশে সহজেই শক্তির কলমে নূতন কবিতা জন্ম নিল। 'অকাল বৃষ্টিতে' নামে কবিতাটি লিখলেন বাংলা বিভাগের স্মারকপত্রের জন্য—

অকাল বৃষ্টিতে
হঠাত অকাল বৃষ্টি শান্তিনিকেতনে
রাত ভোর বৃষ্টি হলো শান্তিনিকেতনে
আমের মঞ্জরী পেলো বৃষ্টি ও কুয়াশা
বসন্তের মুখোমুখি শিমূল পলাশ
ফুল বৃন্তচ্যুত হয়ে খসে পড়ে ঘাসে
মানুষ স্থগিত ঘরেচক্রে বসে আছে।

স্মারকপত্রের প্রথম পাতায় এই কবিতা ছাপা হল। সম্ভবত এটিই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা শেষ কবিতা তাঁর জীবৎকালে মুদ্রিত।

ফেব্রুয়ারির শেষে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে শক্তি চলে গেলেন ব্যাঙ্গালোর।

শান্তিনিকেতনে ফিরলেন বারোই মার্চ। মতি নন্দীও সেদিন কলকাতা থেকে এলেন বাংলা বিভাগের সেমিনারে বক্তৃতা দিতে। সন্ধায় চীনভবনে আয়োজিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করলেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ভিডিটিং প্রফেসার শক্তি ও শরৎ সভায় সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন।

শক্তি ও শরতের উপস্থিতিতেই শান্তিনিকেতনে সুনীলের আবির্ভাব। সতেরোই দোল। আমার সঙ্গে ওঁর কথাবার্তা হল পনেরোই মার্চ সকালে। কুড়ি তারিখ সোমবার কলকাতায় ফিরবেন। আমার অনুরোধে তিনি কবি সানন্দে সম্মত হলেন রবিবার উনিশ মার্চ বিকালে বাংলা বিভাগে বিশ্বভারতীর বাংলার অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সঙ্গে আলাপ ও কবিতা পাঠের আসরে বসতে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শক্তির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসের দোতলায় শরতের কুড়ি নম্বর ঘরের পাশে উনিশ নম্বর ঘরে। ডবল বেডের প্রশস্ত ঘর। কোনো কিছুতেই শক্তির অভিযোগ ছিল না বললেন—দেখো, এখানে কেবল রতনকুঠির ওই বারান্দাটাই যা মিস করছি, তাছাড়া বাদবাকি কোনো অসুবিধা নেই। উনি যা-ই বলুন, তেমনভাবে

আমাদের যত্ন করার সামর্থ্য নেই বলে আমাদের অস্বস্তি কিছু কম নয়।

উনিশে কবিতা পাঠের আসর। ষোলোই মার্চের তারিখে বিশ্বভারতীর প্যাডের কাগজে আমন্ত্রণ পত্র লিখে তার জেরক্স করে আমন্ত্রিতদের কাছে বিতরণ করা হল। সেদিন কে জানতো এটিই কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শেষ কবিতা পাঠের আসর! ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে আমন্ত্রণলিপিটি সবটা উদ্ধৃত করা গেল ঃ

তিন কবির সঙ্গে আলাপ

সবিনয় নিবেদন,

সম্প্রতি বাংলা বিভাগে 'ভিজিটিং প্রফেসার' রূপে যোগ দিয়েছেন কবি শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রখ্যাত এই তিন কবির সন্মানে বিশ্বভারতীর সকল ভবনের বাংলার অধ্যাপক-অধ্যাপিকা একত্রে একটি কবিতা পাঠের আসরে মিলিত হতে চাই আগামী ১৯শে মার্চ রবিবার বিকেল ৫টায় বিদ্যাভবন বাংলা বিভাগের সেমিনার কক্ষে। কফি সহযোগে তিন কবির সঙ্গে বৈকালিক এই আলাপে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আসবেন আমরা এই প্রত্যাশা করি। বিনীত

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (অধ্যক্ষ)

১৬ মার্চ, ১৯৯৫।। বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেনিগুলি নিয়ে হিউম্যানিটিজ সেক্শন হল বিদ্যাভবন। তাছাড়া উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে আছে উত্তর শিক্ষাসদন আর মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত দুটি বিদ্যালয় পাঠভবন ও শ্রীনিকতনে শিক্ষাসত্র, এবং আছে বি.এড্ কোর্সের বিনয়ভবন। সেদিন এই সব ভবনের বাংলার অধ্যাপক অধ্যাপিকা একত্রে মিলিত হয়েছিলেন বৈকালিক আসরে তিন কবির সঙ্গে আলাপের ঐকান্তিক আকুলতা নিয়ে।

আমাদের এই ঘরোয়া বৈকালিক আসরে কর্মব্যস্ত উপাচার্য ও কর্মসচিবকে আমন্ত্রণ করা সংগত হবে কিনা ভাবছিলাম। তারপর সাহস করে আমন্ত্রণ জানাতে গেলে উপাচার্য আমাকে প্রথমেই বললেন, —আমাকে মতি নন্দীর সেমিনারের খবরটা দিলেন না। আমি তো ওর রেগুলার পাঠক। সে যাইহোক, কথা হচ্ছে আমি নিশ্চয় উনিশ তারিখের আসরে যাব। এইসব অনুষ্ঠানে বসতে পেলে মশাই আমরা মনের একটু ছুটি পাই। রেজিস্ট্রার প্রফেসার যশ বললেন, আরে আপনি আবার কেন এলেন, নিশ্চয়ই যাব। দাঁড়া লিখে রাখি। উনিশ তারিখ পাঁচটায়।

মোংগিনিজের পেস্ট্রি ও কফিসহ এই ঘরোয়া আসরের প্রথম পর্যায়ে তিন কবির সঙ্গে আমন্ত্রিত সকলের আলাপ পরিচয় ও নমস্কার বিনিময় হল। হল ঘরটায় গোল হয়ে আমরা বসেছিলাম আসরটা যাতে অন্তরঙ্গতার রূপ পায়। পেয়েওছিল। এক প্রস্থ কফি শেষ হবার পর সকলেই বললেন, কবিতা পাঠের সূচনায় একটা গান হলে কেমন হয়? শক্তি ও সুনীল উদয়ে খুবই সম্মতি জানালেন - খুব ভালো হয়। অতিথিদের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না বাংলা বিভাগের সিনিয়রমোস্ট রিডার -ডঃ যুথিকা বসু। 'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান আসিবে আজি বন্ধু মোর' গানের পর শুরু হল কবিতা পাঠের আসর।

তিনজনের মধ্যে কে আগে কবিতা পড়বে? সুনীল, না শক্তি, শরৎ? শেষ পর্যন্ত শক্তি রাজি হল। বেশ, আমিই তাহলে প্রথম পড়ছিঃ

সেগুন মঞ্জরী হাতে দাও, জাগাও আমাকে
আমি আছি বিষঘুমে, জাগাও আমাকে
আমি আছি সর্পদষ্ট, জাগাও আমাকে
বৈরাগ্যে সন্ন্যাসে আছি, জাগাও আমাকে
আমি জাগাবো না, আমি বিষঘুমে, জাগাও আমাকে...

পরপর পড়ে গেলেন একটি একটি করে অনেকগুলি কবিতা। প্রায় একটানা চল্লিশ মিনিট তিনি কবিতা আবৃত্তি করে গেলেন। সে কী গভীর অসামান্য কবিতা পাঠ। তাঁর কবিতা পাঠের মধ্যে একই সঙ্গে রয়েছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আবার সাগরের অতলস্পর্শতা। কী সেই ব্যাকুল বুকফাটা কণ্ঠস্বরের সুতীব্র আবেদন - 'আমাকে জাগাও' 'জাগোও আমাকে।'

সবকটি শ্রোতার চোখেমুখে সে এক অবাক বিস্ময়। এ তো কোনো ছাপা বই থেকে মুদ্রিত অক্ষর দেখে কবিতা পাঠ নয়। একদিন যে আবেগে এ কবিতা লিখেছিলেন আজকের কবিতাপাঠে তার চেয়েও গভীরতর কোনো আবেগ তীব্রতর কোনো অনুভূতি কাজ করছে। 'আমাকে জাগাও' এ যেন কাব্যগ্রন্থের কোনো কবিতার চরণ মাত্র নয়, যেন শক্তি এখন কবিতা পাঠ করছেন – এ যেন সেই স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সেদিন তিনি উন্মোচিত করে তুলেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে সত্যিই তিনি নতুন করে জেগে উঠেছিলেন। নতুন কর্মজীবনকে তিনি একান্ত আবেগ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, ছাত্রছাত্রী পরিবৃত শান্তিনিকেতনের এই পরিবেশ তাঁকে শান্তি তৃপ্তি ও বিপুল আনন্দ দিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে 'অকাল বৃষ্টিতে' কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন, এরপরে তো পুরো বর্ষাটাই পড়ে ছিল। ভেবেছিলাম বৃষ্টিধারার সঙ্গে, তাল মিলিয়ে তাঁর কবিতা রচনার ফসল ফলবে অপর্যাপ্ত অজস্র। আসর শেষে আমাদের মধ্যে কথাও হল ক্লাস, সেমিনার ইত্যাদির বাইরে অবসর সময়ে সুনীল লিখবেন গল্প উপন্যাস, আর কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করবেন শক্তি ও শরৎ। যদিও একথা সত্য যে শান্তিনিকেতনে কবিতা লেখার চেয়ে কবিতা শেখানোর ও কবিতা পড়ানোতেই শক্তি বেশি আগ্রহ বেশি তাগিদ অনুভব করেছিলেন। সম্মত হয়েছিলেন ভবিষ্যতে এম এ ক্লাসে তাঁর কোন্ কোন্ কবিতা পাঠ্যভুক্ত করা যাবে তার একাট তালিকা করে দেবেন। সম্মত হয়েছিলেন জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথ (শেষ পর্যায়ের) ও নিজের কবিতার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করবেন এক একটি ক্লাসে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সব পরিকল্পনা সব বাসনা অপূর্ণ থেকে গেল তাঁর একান্ত আকস্মিক প্রয়াণে। যে পাজামা পাঞ্জাবি পরে বাংলা বিভাগে কবিতা পাঠ করতে এসেছিলেন, সেই পোশাকেই তুষার শয্যায় চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা মহানগরে চলে গেলেন তেইশে মার্চ। আমরা কেউ তাঁকে জাগাতে পারলাম না। কিন্তু তিনি আমাদের জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর এই প্রথম আশ্রমের একজন কবি শান্তিনিকেতনকে এমনভাবে জাগাতে পেরেছিলেন।